॥ নেড়ানেড়ী সৃষ্টী রহস্য ॥

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী মহারাজ

প্রকাশিত হইয়াছে (ব্যাখ্যাসহ)

।। শ্রীচৈতন্যভাগবত ।।

শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরচিত—

ভিক্ষা—২৫০ টাকা

।। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত—

ভিক্ষা—৩০০ টাকা

অদ্যাবধি প্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী

১। খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের পদাবলী—কুড়িটাকা।

২। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—শ্রীগৌরলীলা—ষাট টাকা।

শ্রীকৃষ্ণলীলা—চল্লিশ টাকা।

৩। শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা

—ত্রিশ টাকা।

৪। শ্রীমুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ—মাধব ও বাসুদেব ঘোষের পদাবলী

—পঁচিশ টাকা।

৫। শ্রীবলরাম দাসের পদাবলী—পঞ্চাশ টাকা।

৬। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া পদাবলী—কুড়ি টাকা।

৭। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পদাবলী (মৎ প্রনীত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের সঙ্গে)।

22

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৫০

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

নেড়ানেড়ীর সৃষ্টী রহস্য

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট শ্রীচৈতন্যডোবা।
পোঃ—হালিসহর। উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রকাশক :

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর

উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ : ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

১লা কার্ত্তিক

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন—৫৮৭-০৭৭৫

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরনী
কলিকাতা—৭০০০০৬
ফোন—২৪১-১২০৪

ভিক্ষা ঃ পনের টাকা।

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস
শ্রীচৈতন্যডোবা.

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

॥ সম্পাদকীয় ॥

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দর চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ জীব ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া ভুক্তি-মুক্তি মোক্ষ বাঞ্ছাদি কৈতব বিদূরিত করতঃ নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন। আর সর্ব্ব অবতারের পার্ষদগণ সমবিব্যবহারে অবিভূর্ত হইয়া ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত ব্রজ প্রেম সম্পদ আচণ্ডালে প্রদান করতঃ কলি জীব উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিলেন।

তথাহি—শ্রীবিদগ্ধমাধবে (১/২)

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুনয়াবতীর্ণ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

চির অনর্পিত অর্থ্যাৎ কোন কালে যাহা কাহাকেও দেওয়া হয় নাই সেই উজ্জ্বল অর্থ্যাৎ মধুর রসে রসাল নিজস্ব প্রেম সম্পদ বিতরনের জন্য করুনা পূর্ব্বক অবতীর্ন হইয়াছেন। কিভাবে ব্রজগোপীর আনুগত্য লইয়া মধুর রসাশ্রয়ী ভজন করতঃ ব্রজ গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া মঞ্জরী স্বরূপে শ্রীরাধা গোবিন্দের চির শাশ্বত সেবাধিকার

প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে আচরণ করতঃ জগতকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তৎসঙ্গে শ্রীপাদ রূপ-সনাতন-গোস্বামী কে ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ ও রায় রামানন্দের মুখে সাধ্য সাধন তত্ত্বের ক্রম বিন্যাস পরিস্ফুট করতঃ ভক্তি ধর্ম্মের ঐতিহ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীলরূপ—সনাতনাদি গোস্বামীগণ হরিভক্তি বিলাস নামক স্মৃতিগ্রন্থ ও ভক্তিতত্ত্ব মূলক উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ভক্তিতত্ত্বের ক্রম এবং ভক্তি অঙ্গ যাজনের পদ্ধতি শাস্ত্র প্রমানে প্রতিভাত করিয়াছেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপং কদামহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু মনাভিলাষ শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর দ্বারায় পরিস্ফুট হইয়াছে তদনুকরণে শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, পরবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হইতে গোবর্দ্ধনের সিদ্ধবাবাগণ পর্য্যন্ত পরম্পরা ক্রমে বিশুদ্ধ রাগমার্গীয় ভক্তি ধর্ম্মের ভজন পথ নির্দ্দেশ, পদ্ধতি ও তত্ত্বাদি বিশেষ ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন এতৎ সঙ্গে চরম দুর্দ্দৈব বশতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন হইতে অদ্যাবধি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ

ভক্তি ধর্ম্মের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু উপধর্ম্ম আত্ম প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমানে বিশাল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যেমন বৃক্ষে পরগাছা সৃষ্টি হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়তঃ মূল বৃক্ষকে ক্রমে নিঃস্তেজ করিয়া আনে। তদনুরূপ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ব্রজা-নুগত্য রাগমার্গীয় ভজন পদ্ধতি ও তৎ বিষয়ক সদাচারাদি আজ অত্যন্ত স্তিমিত পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। শুদ্ধাভক্তির ক্রমবিন্যাসে স্বকল্পিত কৃত্রিম ব্যাখ্যা আরোপ করিয়া ভক্তি সত্বার বিলোপ সাধনে তৎপর হইয়াছে। তাই এই যুগসন্ধিক্ষনে শুদ্ধা-ভক্তিকামী সাধক গনের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শুদ্ধা-ভক্তির পদ্ধতি সম্যক অবগত হয়েই ভক্তি অঙ্গ যাজনে অগ্রনী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শুদ্ধাভক্তিকামী সাধকগণের সচেতনার জন্য ইতি পূর্ব্বে গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও চৈতন্য কারিকায় শ্রীরূপ কবিরাজ নামক গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে "নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি রহস্য" গ্রন্থে প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের সৃষ্ট নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি রহস্য বিশেষ ভাবে প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম। আলোচ্য বিষয় শ্রীমনোহর দাস বৈরাগীর জীবন চরিত্র গ্রন্থে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানি মুর্শিদাবাদের টগরার নিবাসী ছোট হরিদাসের শ্রীপাটের সেবাইত শ্রীনৃসিংহ মুখার্জ্জীর সমীপে

প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রনে সচেষ্ট হইলাম। আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৩৫৬ সালে নকুল ব্রহ্মচারীর পাট বাড়ী হইতে শ্রীল বৈষ্ণব চরণ দাস মহান্ত সম্পাদনায় শ্রীগৌরহরি চৌধুরী প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থ দৃষ্টে আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইল। শ্রীবৈষ্ণব চরন দাস মহান্তের গ্রন্থপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার বর্ণন— সন ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় সোনামুখী গ্রামে মনোহর দাস বৈরাগীর সমাধি প্রাঙ্গনে একমাস যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কালীন মাসের শেষদিনে উক্ত "মনোহর দাস বৈরাগীর জীবন চরিত্র" পাণ্ডুলিপি খানি কোন ভক্ত আমার পিতাকে অর্পন করেন।"

শ্রীমনোহর দাস বৈরাগীর জীবন চরিত্র গ্রন্থখানির লেখক শ্রীকৃষ্ণধন চট্টরাজ। গ্রন্থের বর্ণনে বুঝাযায় তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হইয়া এই গ্রন্থের অবতারনা করেন।

চট্টরাজ কৃষ্ণধন, আসিমিলি ভক্তগণ,
ইত্যাদি কার্য্য সকল দেখিল।
ত্রিপদী ছন্দেতে লিখি, সাক্ষাতে সর্ব্বকার্য্য দেখি,
চিত্তে মোর আনন্দ হইল।

গ্রন্থের লিখন কাল বিষয়ে বর্ণন—

সন এগার পঁয়ত্রিশ সালে,   মনোহর ঠাকুরের চরিত্র বলে,

বিস্তার লিখিল কৃষ্ণধন চট্টরাজ।

গ্রন্থের সম্পাদনায় শ্রীল বৈষ্ণব চরন দাস মহান্ত মহাশয় শ্রীমনোহর দাসের সমাধি গ্রহনের পরবর্ত্তী তাঁহার লীলা বৈভব প্রকাশ করিয়া মনোহর দাসের অত্যুজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। তৎসঙ্গে শুদ্ধাভক্তির ঐতিহ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধাভক্তির যে মূল্যায়ন করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রেম অভিধেয় তত্ত্বে ও শ্রীরূপ সনাতন শিক্ষার মাধ্যমে যে ভক্তি ধর্ম্মের অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন এবং ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় যে সাধ্য সাধন তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ ও গোবর্দ্ধনের সিদ্ধ বাবাদি ভজন গুটিকার ক্রম বিন্যাসে যে সাধন পদ্ধতি মূল্যায়িত হইয়াছে। সেই ভক্তি ধর্ম্মের সাধন পদ্ধতি আজ অস্তমিত প্রায়। বিভিন্ন উপধর্ম্মের উচ্ছ্বাসে শুদ্ধা ভক্তির ক্রম বিন্যাস জনমানসে এক প্রহসন বলে মনে হচ্ছে। এই ভক্তিজগতে সুযোগ মুহূর্ত্তে শুদ্ধা ভক্তি কামী সাধক বৃন্দ সচেতন হউন, গোস্বামী শাস্ত্রের বহুল প্রচার ঘটিয়ে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ পরিস্ফুট করতঃ ভক্তজন মানসের তমিস্রা রজনীর অবসান ঘটান, ইহাই একমাত্র কামনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে শুদ্ধাভক্তি প্রবর্ত্তন ও শাস্ত্র প্রচারে শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্মের তাৎপর্য্য সর্ব্ব সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তৎসঙ্গে তাঁহার সমকালীন হইতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের বিরুদ্ধ মতাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডরূপ কৃপা লাভের অভিপ্রায়ে অদ্বৈত প্রভু জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করায় কিছু শিষ্য বিপথ গামী হন।

তথাহি—প্রেমবিলাসে ২৪ বিলাস—

সর্ব শিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল।
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল॥
কামদেব নাগর আর আগল পাগল।
না ছাড়িল জ্ঞানবাদে আর যে শঙ্কর॥
অদ্বৈত বলে, শঙ্কর তুমি হইলে বাউল।
তোর মতে লোক সব হইবে আউল॥
গুরু সঙ্গে জেদ করি অপরাধী হৈলে।
তোরা সিদ্ধি না পাইবি কোন কালে॥

এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈত স্কন্ধ শাখা বর্ণনে বর্নিত রহিয়াছে যথা—

ভবনে গমন করতঃ চিড়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন। ভোজন না পাওয়ায় মহাপ্রভু পান্বিত ভাবে একটি ফুংকার করিলে খড়দহ গ্রাম অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল ও তিনটি বালকের মৃত্যু ঘটিল গ্রাম বাসী প্রভু বীরচন্দ্র সমীপে আবেদন করিলে বীরচন্দ্র যোগবলে গ্রামবাসীর ক্ষতিপূরন সহ তিন বালকের জীবন দান করিলেন ইহার কিছু দিন পরে বৈরাগী দাস বৈরাগী ক্ষুধা নির্ব্বাপনের জন্য ভিক্ষার তণ্ডুল একটি পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া ফুংকার করিলেই এক পুষ্করিনী অন্ন প্রস্তুত হইল। গ্রামবাসী ঐ অন্ন গ্রহনে অসম্মত হওয়ায় সেই অন্ন গ্রামের প্রত্যেক গৃহের রন্ধন হাঁড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এ ব্যাপারে গ্রামে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল বৈরাগী দাস বৈরাগী নিজ কায় ব্যূহ ভাবে বহু মূরত্তি ধারন করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে গমন করতঃ একই সময়ে ঐ অন্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিলেন উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে শান্ত দাস বৈরাগী আর বৈভব প্রকাশ করিলেন। একদিন শান্ত দাস বৈরাগী যোগবলে বহুমূরত্তি ধারন করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে খড়দহ গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে গমন করতঃ ডাকিয়া বলিলেন যে, তিন দিবসের মধ্যে বারশত বৈরাগী-কে ভোজন না দিলে সকলে মুখে রক্ত উঠিয়া মরিয়া যাইবে।

অন্যান্য বৈরাগীগণ গ্রামের ফলমূল ও ভোজনীয় দ্রব্যাদি অপহরণ এবং নষ্ট করিয়া গ্রামবাসী গণকে মহাবিপদাপন্ন করিতে লাগিল। অনন্যোপায় গ্রামবাসী গোপনে প্রভু বীরচন্দ্রের শরনাপন্ন হইলেন। বীরচন্দ্র নাড়া বৈরাগীগণের তেজ নাশের জন্য উপায় চিন্তা করিয়া বিমাতা জাহ্নবা দেবীর পালিত পুত্র রামাই পণ্ডিত সমীপে বাঘ্নাপাড়ায় পাঠাইলেন। বলিলেন তোমারা রামাই পণ্ডিতের তেজ বিনাশ কর। প্রভু বীরচন্দ্রের আদেশে নাড়াগন সমবেত হইয়া ভৈমী একাদশীর পর দ্বাদশীতে রওনা হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাঘ্নাপাড়ায় রামাই পণ্ডিত সমীপে পৌছাইয়া বলিলেন; আমাদের বারশত জনকে এখনই প্রত্যেকে পাঁচ সের মধু, ব্রীহি কলাইর ডাল, কঁাচা আম সহ ইলিশ মাছের অম্বল, আর মাখা তরকারী দিতে হবে। রামাই পণ্ডিত মাতা জাহ্নবা দেবীর স্মরন প্রভাবে তৎক্ষনাৎ সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন এতদ্বিষয়ক কাহিনী মুরলী বিলাস গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে। যমুনা পুকুর মধু হইল, বকুল বৃক্ষে আম্র ও পুকরিনীতে ইলিশ মৎস্য প্রাপ্ত হইল। প্রত্যেক নাড়ার বসবাসের জন্য পৃথক পৃথক শয়ন কক্ষ মধ্যে খট্টা,

শয্যাদি প্রস্তুত করিলেন। রামাই পণ্ডিতের এই ঐশ্চর্য্য দেখিয়া নাড়াগন বিভাবিত হইল। স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য মনোহর দাস, শম্ভুদাস বৈরাগী, বৈরাগী দাস গোপনে রামাই পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাত করিয়া নিজেদের দোষ স্বীকার করতঃ পদধূলি গ্রহন পূর্ব্বক বিভিন্ন দেশে পলায়ন করিলেন। এদিকে অন্যান্য নাড়াগণ দম্ভ করিয়া ভোজনে গমন করিল। পরস্পরে আলোচনা করিল যে, আমাদের নির্দ্দেশিত খাদ্য না দিতে পারিলে আমরা ভস্ম করিব। কিন্তু আদেশ মত খাদ্য না খাইলে আমাদের ভস্ম করিবে এই বলিয়া সকলে ভোজনে বসিল। এদিকে রামাই পণ্ডিত নেড়াদের জন্য তেরশত সুন্দরী রমনী সৃষ্টি করিয়া তাদের সেবাদাসী রূপে শয়ন কক্ষে পাঠাইলেন। নাড়াগন স্ত্রীরূপে মোহিত হইয়া পূর্ব্ব আদর্শ বিস্মৃত হইল। এই ভাবে নাড়াগণের তেজ ভ্রষ্ট হইলে পরদিবস প্রভাতে রামাই পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই সকলে মালদহ জেলা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এমনকি খড়দহে গিয়া প্রভু বীরচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তখন হইতে নেড়ানেড়ীগণ মৎস্য ভোজন, দিনান্তে মৎস্য না পাইলেও মৎস্যের আইস ধৌত জল পান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবে।

ভোজনের পূর্ব্বে যে তিন জন নাড়া পলায়ন করিলেন; তাহাদের মধ্যে বৈরাগী দাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার পশ্চিমে দৈদে গ্রামে (বর্ত্তমানে দৈদে বৈরাগীতলা) একটি আম্র কাননে বাস করিয়া নানা প্রকার বৈভব প্রকাশ করেন। শান্ত দাস বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার অনতিদূরে অম্বুয়া মুলুক বর্ত্তমানে প্যারীগঞ্জ নামে বিখ্যাত। তথায় নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাটের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সমাধিস্থ হন। অদ্যাপি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান- মনোহর দাস বর্দ্ধমান জেলার ঘোষপাড়া গ্রামে দুলাল ঘোষের বাটীতে পনের দিন অবস্থান করতঃ তাহাকে কৃপা করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। একবর্ষ কাল তীর্থ ভ্রমন অন্তে জগন্নাথ দর্শন অন্তে আর বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী গ্রামে শ্যামচাঁদের মন্দিরে আগমন করেন। তথায় অবস্থান করিয়া লীলাবৈভব প্রকাশ করেন। তথায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। তাঁহার জীবন আলেখ্যই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁহার জীবনী আলেখ্যের মধ্যে নেড়া গণের সৃষ্টি রহস্য বিদিত থাকায় তাঁহার জীবনী গ্রন্থ খানি "নেড়া-নেড়ি সৃষ্টি রহস্য" নাম করণে প্রতিভাত হইল। এই সকল তথ্য

প্রথমেত একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহোত আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহত স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত সেই সেইমত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে—সেইত অসার॥

কলি জীবকে মোহ গ্রস্থ করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বীরচন্দ্র রূপে প্রকট হইয়া বহু উৎপথ গামীর সৃষ্টি করেন।

শ্রীচৈতন্য কারিকা—১ অধ্যায়।

বীরচন্দ্র রূপে বহু লীলা প্রকাশিলা।
নাড়া—নেড়ী, বাউল বৈষ্ণব অনেক করিলা॥

তৎপরবর্ত্তী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রূপ কবিরাজ রূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তিধর্ম্মের বিপরীত পন্থা প্রবর্ত্তন করতঃ ভক্তি জগতে তমিস্রা রজনী পরিস্ফুট করিলেন, শ্রীরূপ কবিরাজ বিষয়ে শিবানন্দ সেন পুত্র চৈতন্য দাসে চৈতন্য কারিকা গ্রন্থ ও নরহরি দাসের নরোত্তম বিলাসের গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে ও বহির্ম্মুখ প্রকাশ গ্রন্থে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে বহির্ম্মুখ প্রকাশ গ্রন্থখানি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত

হয় নাই। নং প্রনীত গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ গ্রন্থে রূপ কবিরাজ বিষয়ক তথ্যাদি জানিতে পারিবেন। এই সকল শুদ্ধাভক্তির প্রতিকুল ধর্ম্ম অদ্যাবধি বহু মুখী ভাবে আত্ম প্রকাশ করায় শুদ্ধা ভক্তি ধর্ম্ম অস্তাচল গামী হইতে চলিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থ খানিতে প্রভু বীরচন্দ্র হইতে উদ্ভুত নেড়া-নেড়ী সৃষ্টির রহস্যাদি সহ তাহাদের চিন্তাধারা পরিস্ফুট করার প্রয়াস করা হইয়াছে নেড়নেড়ী বিষয়ে শ্রীলবৃন্দাবন দাস বিরচিত নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে ও সপ্তম স্তবকে বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। নাড়াগনের ঐশ্চর্য্য প্রকাশ প্রভু বীর-চন্দ্রের প্রেম প্রচারের বিশেষ সহায়ক ছিলেন শেষে তাহাদের ঐশ্চর্য্য শক্তির বিলোপ ঘটাবার জন্য এক লীলার প্রকাশ করেন।

শ্রীপাট খড়দহে প্রভু বীরচন্দ্র ভক্তগণ সহ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে রহিয়াছেন। এদিকে নাড়াগন পর্য্যটন অন্তে আসিয়া মাতা জাহ্নবা সমীপে প্রচণ্ড ক্ষুধার কথা বলিলেন। তখন জাহ্নবা দেবী প্রভুর ভোগ অন্তে প্রসাদ পাইবে বলিলে নাড়াগন এক ঐশ্চর্য্য প্রকাশ করিল।

ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি।
জ্বলিল জ্বলিস বলি কহয়ে ফুৎকারি॥
এতেক কহিতে অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল।
দেখিয়া সকল লোক কোলাহল কৈল॥

এই সংবাদ প্রভু বীরচন্দ্র সমীপে পৌঁছিলে প্রভু নাড়া গণের শক্তি নাশের জন্য এক অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিলেন।

নাড়ার তেজ দেখি প্রভু মনে বিচারিয়া।
নাড়ী সৃষ্টি কৈল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
তেরশত নাড়ী সৃষ্টি ইঙ্গিতে করিলা।
ভুবনী মোহনী সব রূপেতে উজ্জ্বলা॥
ষোড়শ বৎসর সবে যৌবনে উন্নত।
দেখিয়া সকল নাড়া হইলা মোহিত॥
হাসি হাসি প্রভু সব নাড়া বোলাইল।
এক দুই করিয়া নাড়ারে পুছাইলা॥
মোহিত সকল নাড়া নাড়িরে দেখিয়া।
অঙ্গীকার কৈল নাড়া প্রভু আজ্ঞা পাইয়া॥
কৈ কৈ নাড়া তাহে বিবেকী আছিল।
নাড়িতে দেখিয়া ত্যাগীগণ পলাইল॥

মহাপ্রভু বীর চন্দ্রের ভয়ের লাগিয়া।
জলের ভিতরে যাই রহিল ডুবিয়া ॥
দুই এক মাসে রহিল ডুবিয়া যে জলে।
মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের ঐছে কৃপাবলে ॥
হেনমতে নাড়াগনে প্রভু দণ্ড কৈল।
সেই হৈতে সম্ভোগী বৈষ্ণব সৃষ্টি হৈল ॥

০ ০ ০ ০

যেই যেই নাড়া স্ত্রী সঙ্গ ভয়ে পলাইল।
আত্ম মায়াকাশে তাহা রহিত হইল ॥
সেই নাড়া যে স্থানে আশ্রম করিল।
সেই সেই স্থান মহাসিদ্ধ পীঠ হইল ॥

আলোচ্য গ্রন্থে স্ত্রী সঙ্গ রহিত নাড়াগণের মহিমা বিদিত রহিয়াছে। মুরলী বিলাস গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদে বাঘ্নাপাড়ায় নাড়াগণের ঐশ্চর্য্য প্রকাশ কাহিনী উল্লেখিত রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকের বর্ণিত নেড়গনের তেজ নষ্টের কাহিনী সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। নেড়গনের তিনজন প্রধান মনোহর দাস বৈরাগী, বৈরাগী দাস বৈরাগী ও শম্ভু দাস বৈরাগী একদিন খড়দাহে প্রাতঃকালে মনোহর দাস বৈরাগী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিশিষ্ট লোকদের

সার্ব্বজনীন বিশেষ প্রচার না থাকায় ইহার প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গ্রন্থরূপে প্রকাশে সচেষ্ট হইলাম সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার সর্ব্বাঙ্গস্বরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া অপ্রকাশিত প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যটি আস্বাদন করুণ। আর বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপর্যয়ের যুগে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের আসল রহস্য জ্ঞাত হইয়া শুদ্ধভাবে গৌর গোবিন্দের ভজনানন্দে বিভোর হউন। এখন সুধী ভক্ত মণ্ডলী আমার সর্ব্বাঙ্গস্বরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করুন।

শ্রীশ্রীপ্রান কৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা। পোঃ-হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা। পশ্চিমবঙ্গ

১৪০৭ বঙ্গাব্দ

নিবেদক
শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয় — পৃষ্ঠা

—০—

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষণা মূলক কতিপয় গ্রন্থাবলী

১। চৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—১০ ২ জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত—২৫ ৩ গোড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—১০ ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—৬০ ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী দশম খণ্ড—২০০ ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গগনোদ্দেশাবলী—২০ ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম্ম—১ ৮ নিত্যানন্দ চরিতামৃত—২০ ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—১২ ১০ সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ—৫ ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—৭ ১২। অভিরাম লীলামৃত—২০ ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ ৪ ১৪। সাধক স্মরণ—১০ ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় ১০ ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি —৮০ ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—৫ ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—৫ ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত্র ও শ্যামচন্দ্রোদয়—৫ ২০ অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—৬ ২১ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী —২০ ২২ অনুরাগবল্লী—৭ ২৩ পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ—৩০ ২৪। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য—৬ ২৫। শ্যামানন্দ প্রকাশ—২৫ ২৬। সপার্ষদ গৌরাঙ্গলীলা রহস্য—৮০ ২৭। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—১০ ২৮ নিতাই অদ্বৈত মাধুরী—১২ ২৯ পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ=নরহরি সরকারের পদাবলী—২০ নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—শ্রীগৌর লীলা—৬০

শ্রীকৃষ্ণ লীলা—৪০ ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর পদাবলী—৩০ মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষ—২৫ বলরাম দাসের পদাবলী—৫০ ৩০। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—৭ ৩১। অভিরাম লীলা রহস্য—৭ ৩২। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—৫ ৩৩ জগদীশ চরিত্র বিজয়—২৫ ৩৪। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—৪০ ৩৫। মনঃশিক্ষা—১০ ৩৬। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা (ইং) —৭ ৩৭ বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া-১ খণ্ড-৪০, ২খণ্ড-৩০, ৩য় খণ্ড-৩০, ৩৮। শুভাগমনী স্মরণিকা—৫ ৩৯ মনঃশিক্ষা—১০ ৪০। রসিকমঙ্গল—১ খণ্ড-২৫, ২ খণ্ড-২৫, ৪১ শ্রীচৈতন্য শতক —৭ ৪২ অদ্বৈত প্রকাশ—৪০ ৪৩। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচড়াপাড়া—৫ ৪৪ বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—১০ ৪৫ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী ১ খণ্ড-১০০ ২ খণ্ড-১৫০, ৪৬ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত—২০ ৪৭ শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—২০ ৪৮। অদ্বৈত মঙ্গল—৪০ ৪৯। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্টলীলা—৪০ ৫০ নেড়ানেড়ি সৃষ্টি রহস্য—১৫ ৫১। অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিন্যাস—৭ ৫২। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার রজত জয়ন্তী সংখ্যা —২০ ৫৪। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—৩০০ ৫৫। শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ চরিত্র—৫০ ৫৬। শ্রীঅদ্বৈত পার্ষদ চরিত্র-৩০ ৫৭ শ্রীগদাধর পার্ষদ চরিত্র-৩০।

—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

॥ নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি রহস্য ॥

(শ্রীল মনোহর দাস বৈরাগীর জীবন চরিত্র)

মঙ্গলাচরন

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদ কমলং শ্রীগুরূণ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদন্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

জয়ন্ত চৈতন্যপদারবিন্দং ভবন্ত সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্ত ত্রিজগদ্বিচিত্রং মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়া ক্ষমাদ্যৈঃ ॥ ২ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুং বন্দে তৎসুতঃ বীরচন্দ্রকঃ।
বীরচন্দ্রস্য শিষ্যাং বৈ দ্বিশতঞ্চ সহস্রকং ॥ ৩ ॥

শিষ্যানান্তু প্রবরঞ্চ প্রথমো দ্বিঃ ক্রমাত্ত্রয়ং।
প্রথমন্তু মনোহরো দাসো বৈরাগী খ্যাতকঃ।
দ্বিতীয়ং বৈরাগী দাসঃ তৃতীয়ং শান্ত দাসকঃ।
চতুর্থং পরিশিষ্টং যৎ নেড়া নেড়ীতি খ্যাতকঃ ॥ ৪ ॥

দামোদর পারে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
দারিদ্র ভাবেতে বহুদিন কাটাইল॥
মনে চিন্তা করে দ্বিজ পেট ভরে কিসে।
চিন্তাতে করিল স্থির কাষ্ঠ উদ্দেশে।
বন প্রান্তে যাইয়া কাষ্ঠ কাটিল কিঞ্চিৎ।
লইয়া বিক্রয় করি অর্থ পাইল কিঞ্চিৎ॥
প্রতিদিন এই প্রকার অর্থ উপার্জ্জন।
কাটিতে কাটিতে বনে সাধুর আগমন॥
সাধু বলে অগ্রে বিপ্র করহ গমন।
বহু রত্ন পাবে তুমি না কর অন্য মন॥
সাধুর বাক্য শুনি অগ্রে যাই কাষ্ঠ কাটে।
ক্রমে ক্রমে অগ্রসর রৌপ্য খনির নিকটে॥
তাহা পাইয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জন হইল।
পরে অগ্রসরে দ্বিজ সোনার খনি পাইল॥
বহু অর্থ সঞ্চয় এবং ভিক্ষুকেতে দান।
ক্রমেতে সর্ব্ব ভব্য লোকের পাইল সম্মান॥
ভব্য সর্ব্বে দেখিল সোনার খনি হেথা।
দেখিতে দেখিতে সোনা উড়ি গেল কোথা॥
সোনা যথা সোনা যথা বলিতে বলিতে।

সোনামুখী নাম হইল (ঐ) বনের আচম্বিত ॥
যীর হাম্বীর রাজা যাই অধিকার কৈল।
উক্ত দ্বিজ দ্বারে তিঁহো রাধাশ্যাম স্থাপিল ॥
অগ্রসরের ফল হয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি।
অগ্রসর কথাটি সাধুর অত্যন্ত মন ব্যাপ্তি ॥
প্রতিষ্ঠা করাইয়া বহু সম্পত্তি দানিল।
ক্রমে ক্রমে ঐ গ্রামে ভব্য দ্বিজ বাস কৈল ॥
তথা বহু দেবী সেবা প্রকাশিয়া।
ভব্য ভব্য তন্তুবায় বসিল আসিয়া ॥
এই সোনামুখী গ্রামের পরিচয় হয়।
অদ্যাবধি সোনামুখী লোকজনে কয় ॥
তর্জ্জার ছন্দেতে ইহা লিখিতে যে হয়।
চট্টরাজ কৃষ্ণধন দ্বিজ সে বর্ণয় ॥

সেই শ্যামচাঁদ আর রাধাঠাকুরাণী।
অদ্যাবধি বিরাজয় সাক্ষাৎ দেবদেবী জানি ॥
সেবাইৎ ঐ দ্বিজশ্যাম চট্টরাজ আখ্যান।
সেবা অধিকারে হয় অধীকারী মান ॥

উক্ত ব্রাহ্মণের নামেতে নাম বিগ্রহের হইল।
ঐ নামে শ্যামচাঁদের প্রতিষ্ঠা স্থাপিল॥
ইহার পুত্রের পুত্র শ্রীরাম অধিকারী।
নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সদা হয় সদাচারী॥
শ্যামচাঁদ ভিন্ন তাঁহার অন্তে অনে নাহি মন।
ত্রিসন্ধ্যা স্নান আর বিগ্রহ সেবন॥
রাম অধিকারীর এক পুত্র মনোহর।
ইহাকেই সেবা দিয়া অধিকারী গেল লোকান্তর॥
এইকালের পরিমাণ দশ শত ছিয়ানব্বই সালে।
মনোহর দাস বৈরাগ্য পৌছিল বৈকালে॥
জিজ্ঞাসিয়া পৌছেন শ্যামচাঁদের মন্দিরে।
মনোহর অধিকারী তথা কাঁদে ধীরে ধীরে॥
তাহা দেখি মনোহরদাস বৈরাগী যে কহে।
কি জন্য কাঁদিছ তুমি কেন মন দহে॥
অধিকারী কহে মোর পিতা যে মরিল।
সেবা চলাইবার ভার আমারে অর্পিল॥
ধন সম্পত্তি নাহি জানি কিসে সেবা হবে।
দাস বৈরাগী কহে তবে অবশ্য হইবে॥
তোমার পিতা বহু মুদ্রা রেখেছেন মন্দিরে।

শয়ন সিংহাসনের নিম্নে রেখেছেন ভিতরে ॥
অধিকারী যাইয়া তথা মুদ্রা ভাণ্ড পায়।
গ্রাম্য জনে পরিবারে ডাকিয়া দেখায় ॥
মোর পিতা অর্থ ভাণ্ড রাখেন গোপনে।
পরিণামে শ্যামচাঁদের সেবার কারণে ॥
এই বৈরাগী কোথা থাকে জানিল কেমনে।
ইহার বৃত্তান্ত পুছ রহেন কোন বনে ॥
মনোহর দাস বৈরাগী বলে প্রভুর কৃপায়।
জানিল মুদ্রার ভাণ্ড অবশ্য যেথা রয়।
তর্জ্জার ছন্দেতে ইহা লিখিত যে হয়।
চট্টরাজ কৃষ্ণধন দ্বিজ যে কহয় ॥

গ্রামের সর্ব্বলোক হইল চমৎকার বিস্ময়।
গোপনীয় বস্তু জানেন এই মহাশয় ॥
মহা বিদ্বান্ পণ্ডিত এই হইবে কোন ধীর।
ইহাকে এই গ্রামে রাখ স্থান করহ সুস্থির ॥
তদা মনোহর দাস বৈরাগী সুধীর।
পুছে পূজারীর নাম হইয়া সুস্থির ॥

পূজারী কহয়ে মোর নাম মনোহর।
অধিকারী উপাধি মোদের শুন সাধুবর॥
তদা দাস বৈরাগী চিন্তা করিল যে স্থির।
নামে নামে মৈত্রতা করি হেথা হইব সুস্থির॥
শ্যামচাঁদ সেবা দেখি বড়ই সুন্দর।
রহিব সেবিব ঐ যুগল কিশোর॥
এত ভাবি মনোহর দাস বৈরাগী যে কহে।
তোমার নাম আমার নাম সমান যে রহে॥
অতএব উভয়ে আমরা মিত্রতা করিয়া।
শ্যামচাঁদের সেবাকার্য্য করি জীবন ধরিয়া॥
গ্রাম্যজন জিজ্ঞাসয় সাধু কোন স্থানে রবে।
মনঃপূত স্থান তুমি দেখিয়া লইবে॥
বৈরাগী শুনিয়া বলে মুই আসিতে দেখিনু।
গ্রামের উত্তর দিকে স্বল্প বনে স্থির কৈনু॥
তথা দেখিয়াছি এক পুষ্করিনীর ঘাট।
রাসমঞ্চ হয় তথা শ্রীশ্যামচাঁদের নাট॥
সোনামুখী প্রান্ত আর বনের প্রান্তে।
এখন রহিব আর রহিব জীবনান্তে॥

সম্প্রতি শ্রীশ্যামচাঁদের হেথায় রহিব।
পরে স্থিতি স্থান আমি তথায় রচিব॥
ইহা কহি দ্বার পাশে গৃহ এক হয়।
গ্রাম্য জনে সেই গৃহ করিল নির্ণয়॥
দাঁড়াইয়া রহেন সাধু আগন্তুক বেশে।
সর্ব্বসঙ্গে কথা কহেন সুমধুর হেঁসে॥
পয়ারের ছন্দেতে ইহা লিখিত যে হয়।
চট্টরাজ কৃষ্ণধন দ্বিজ যে রচয়॥

ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব পাটে যাইবার কালে।
শ্যামচাঁদের দর্শনার্থী আসিল সকলে॥
শ্যামচাঁদে না দেখিয়া দেখয়ে বৈষ্ণব।
আপাদ মস্তক দেখি করে অনুভব॥
এমত বৈরাগী শান্ত কভু না দেখিনু।
মহাপুরুষ হয় ইহা নিশ্চয় মানিনু॥
অদ্য মোদের জন্ম ধন্য এ গ্রামেতে স্থিতি।
ইহা মনে করি দেখ বৈষ্ণব মুরতি॥
পদতল শোভা করে পাদুকা দুই গোটা।

শুভ্র বহির্ব্বাস মধ্যে ডোর কৌপিন অাঁটা।
ভুজ যুগ কজিতে শোভা তুলসীর মালা॥
তিন কণ্ঠি তুলসীমালা সুশোভিত গলা।
চন্দ্রের কিরণ যৈছে মালাতে গমন।
চন্দন সুগন্ধি ছুটি ভরিল ভবন॥
সুপ্রসস্ত ললাটে তিলক শোভা পায়।
কেশহীন মস্তক আর ভুজে তিলক হয়॥
দীর্ঘকায় প্রশস্তদেহ অজানু ভুজ হয়।
সূর্য্যের কিরণ সম দেখি অঙ্গ তেজময়॥
একালেতে আছিল বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন।
চট্টরাজ আমি তথা আছি কৃষ্ণধন।
দেখিনু অপূর্ব্ব শোভা বৈষ্ণবের হয়।
জিজ্ঞাসিনু ঠাকুরে তুমি কহ পরিচয়॥
বৈরাগী কহয়ে শুন দিব পরিচয়।
মোর নাম মনোহর দাস বৈরাগী কহয়॥
বৃন্দাবনে গিয়াছিনু দর্শনেতে সুখী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এবে এলাম সোনামুখী॥
তিন জনা হই মোর একই আকার।
আসুয়া মুলুকে বৈসে, দৈদে গ্রামে আর॥

ইহা শুনি দেখি সর্ব্বে হৈল চমৎকার।
কেহ বলে কহ সাধু কি হইবে আহার॥
রাত্রিতে শ্যামচাঁদের ভোগ হয় চিঁড়া দুগ্ধ।
সাধু কহে তাহাতেই আমার মন মুগ্ধ॥
ঠারে ঠোরে চট্টরাজ অন্তরে বুঝিল।
চিঁড়া দুগ্ধ প্রসাদ ভোজন তাহা প্রকাশিল॥
দাস বৈরাগী বলেন আমি অন্ন নাহি খাই।
চিঁড়া দুগ্ধ রম্ভা গুড় সন্ধ্যাপর ভোগ যে দেখাই॥
এই নিয়মে প্রতিদিন আমার ভোজন নিশ্চয়।
রাজভোগে অন্নভোগে নাহি মোর মন॥
হুজ্জোর ছন্দেতে এবে করিনু বর্ণন।
সোনামুখী বসবাস চট্টরাজ কৃষ্ণধন॥

সন্ধ্যারতির কালে কীর্ত্তন যাহা কিছু হইল।
বিশ্রামিয়া শ্যামচাঁদের চিঁড়াপ্রসাদ পাইল।
রাত্রিযোগে নিদ্রা নাহি নিত্যলীলা স্মরি।
চারি দণ্ড নিদ্রা উঠি বলেন হরি হরি॥
মনোহর মুরতি শ্যামচাঁদের দর্শন করিয়া।

ক্ষণকাল ভাবেন সাধু শ্রীচরণ স্মরিয়া ॥
কেন করি তীর্থযাত্রা না ভ্রমিব আর ।
কায়মন বাক্য সর্ব্ব শ্যামচাঁদে দিব ভার ॥
এস্থান ত্যজিয়া অন্য স্থানে নাহি যাইব ।
চরণামৃত আর রাত্রে চিঁড়াপ্রসাদ পাইব ॥
ইহা স্থির করি সাধু শ্যামসেবায় দিল মন ।
তীব্র অনুরাগ ভরে করেন ভজন সাধন ॥
আমি কৃষ্ণধন চট্টরাজ নিত্যকৃত্যে যাই ।
পথিমধ্যে মনোহর দাসের প্রাতে দেখা পাই ॥
বিবরিয়া কহে সাধু উক্ত ভাবনা বিভব ।
আমি যে কহিলাম তখন ইহা সাধুগণের সম্ভব ॥

—

অরুণোদয়ে করি স্নানে জপ তপ সমাধানে
পুষ্প সাজী করেতে লইয়া ।
নানাপুষ্প অন্বেষণে ভ্রমি ভ্রমি গ্রামে বনে
ফিরিতেন সাজী ভরাইয়া ॥
কুশাসন পাতিয়া বসি শ্যামচাঁদ মুখশশী
সম্মুখেতে দরশন লাগি ।

তৎকালেতে অধিকারী শ্যামচাঁদের পূজা সারি
ধুপারতি করিবারে লাগি।
আয়োজন হয় যখন সাধু মালা দেয় তখন
পরে ধূপ আরতি যে হয়।
আমি চট্টরাজ তখন পৌঁছি শ্যামচাঁদের ভবন
বাদ্য করি কাঁসর যে হয়।
পরে দাস মনোহর মালা গাঁথেন থরে থর
আর গাঁথেন মাথায় মুকুট।
শাল পত্রে রাখি মালা সাধুভাবে বিভোর হৈলা
মনে পঁহুচে শ্যামের নিকট।
মালা ভোগ শেষ হইল রাধাশ্যামে বসাইল
তুলসী চন্দনে পুনঃ পূজে।
শ্যাম শিরে বক্ষ পদে পুষ্প আভরণ বাঁধে
বাজু বন্ধ বাঁধিল যে ভুজে।
ভাবেতে বিভোর হৈয়া ঊর্দ্ধে বাহু উঠাইয়া
করিতেন সংকীর্ত্তন গান।
কভু ফুল শয্যা করি রাধাশ্যামে ছাড়াছাড়ি
কত মতে ভাঙ্গাইতেন মান।
করেতে চামর ধরি ধীরে সুব্যজন করি
ভাবেন মনে নিদ্রাগত শ্যাম।

চারি দণ্ড শেষ নিশা অনুমানে হৈল দিশা
দ্বার চাপি করয়ে বিশ্রাম।
কিঞ্চিনিদ্রা অনুভবে সাধু যে উঠিয়া তবে
সিনানের লাগিয়া গমন।
সাধু নিত্য কৃত্য সারি সাজী লইয়া অনুসরি
পুষ্প লাগি করিল গমন।
সূর্য্যোদয় কাল হেরি মনোহর অধিকারী
শ্যামচাঁদের মন্দির খুলিল।
এদিকে সাধু পুষ্প লয়ে শ্যামচাঁদের মন্দিরে ধ্যায়ে
আসি শ্যামের সম্মুখে বসিল।
ফুল শয্যা শয়নে শ্যাম অধিকারীর মনোরম
আনন্দেতে শ্যামে উঠাইল।
পূজার আয়োজন করি তৎক্ষণে পূজা সারি
শ্যামচাঁদের দরজা খুলিল
চট্টরাজ কৃষ্ণধন আসি মিলি তৎক্ষণ
ইত্যাদি কার্য্য সকল দেখিল।
ত্রিপদি ছন্দেতে সাক্ষাতে সর্ব্বকার্য্য দেখি
চিত্তে মোর আনন্দ হইল।

একদিন গ্রামস্থ দ্বিজ মিলিয়া একত্রেতে।
মুই কৃষ্ণধন তথা মিলিল সঙ্গেতে ॥
চল যাই শ্যামচাঁদের অঙ্গনে সবাই।
দাস মনোহর কোন জাতি পুছিব তাঁর ঠাই ॥
দাস শব্দ আছে তাঁর ব্রাহ্মণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ ভিন্ন শ্যাম বিগ্রহ কি জন্য স্পর্শিবে ॥
ক্রমে ক্রমে সবে আসি মিলিল তথায়।
দাস মনোহরে তরে কিছু জিজ্ঞাসয়।
কোন জাতি হও তুমি কেন দাস পরিচয়।
শ্যামচাঁদে স্পর্শ কর ইহা উচিত না নয় ॥
শুনি দাস মনোহর কিছু স্তম্ভিত হইল।
ক্ষণকাল পরে ধীরে কহিতে লাগিল ॥
মুই যোগ্য নহি এ সভায় কথা বলিবার।
সত্য পরিচয় কহি করি পরিহার ॥
পশ্চিম মিথিলা দেশে মোর জন্ম হয়।
কান্যকুব্জ বংশে মোর জনম নিশ্চয় ॥
দশমাস গতে মোর মাতা যে মরিল।
পরে বৎসর গতে পিতা পরলোকে গেল ॥
তথায় আছিল এক পুত্রহীন ব্রাহ্মণ।

মোরে লইয়া বর্দ্ধমানে করিল গমন ॥
ক্রমে উপযুক্তকালে আনি মিথিলার ব্রাহ্মণ।
উপনয়নে পাথ্য পিতা খরচ করিল তখন ॥
বয়স মোর বিংশতিতে পালয়িতা পিতা যে মরিল।
আমি সংস্কৃত পড়ি তাহা না ছাড়িল ॥
অতঃপর বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশ গতে।
চোর সহ পরে মৈত্রতা হইল আচম্বিতে ॥
তার সহ পরে মোরে ধরিল নবাব।
মুই অপরাধী নহি বলি না শুনে জবাব ॥
তৎকালেতে সিনান সময় যাব বহি।
অপরাধী বারশত গঙ্গাতীরে মোরা রহি।
ইহার পূর্ব্বেতে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী
বিগ্রহ নির্ম্মাণহেতু প্রস্তর খুঁজেন আগামী
মো সবারে দেখি গোঁসাই কহেন এক কথা।
তোদের খোলোসা কর্ব্ব মোর শিষ্য হবি যথা ॥
ইহা শুনি স্বীকার কৈনু সবে কষ্ট নিবারিতে।
বিগ্রহ প্রস্তর পাইল প্রভু নবাব দরজাতে ॥
নবাবে করিলেন খবর প্রস্তর যে দিবে।
আর বারশত কয়েদী এখনি ছাড়িবে ॥

স্বীকার না কৈল নবাব গোস্বামী তখন।
নবাবের দরজায় বসি উদরের জল নিঃসরণ॥
জলেতে সে ভাসি গেল নবাবের ফুলবাগান।
দেখি নবাব লোক পাঠায় বুঝহ সন্ধান॥
লোক যাই ফিরি কহে তুমি নবাব শুনহ।
সেই হিন্দু ফকিরের উপস্থ জল অতি ভয়াবহ॥
শুনি নবাব কহে কয়েদী এখন ছাড়ি দেহ।
প্রস্তর লইয়া যাউক কিছু না বলিহ কেহ॥
তবে শুনি গোঁসাই চিমটা ঘাত করিল পাথরে।
সেই পাথর ছুটি আসি পড়ে গঙ্গার ভিতরে॥
গঙ্গাজলে পড়ি পাথর ভাসি ভাসি উজান চলিল।
খড়দহের ঘাটে যাই পাথর ভাসিতে লাগিল॥
মোরা বারশত সবে অপেক্ষা করিতে আছিল।
শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী তথা আসিয়া পৌছিল॥
সঙ্গে লোকজন কিছু আর বহির্ব্বাস কৌপীন।
পরামাণিক পঞ্চাশী জন ক্ষৌরকর্ম্মেতে প্রবীন॥
তথা হৈতে কৃপা করেন বীরচন্দ্র গোঁসাই।
ক্ষৌর হইয়া ভেকমন্ত্র পাইলাম সবাই॥
ভেকাশ্রিত শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীর নিকট।

হইল সর্ব্বশুদ্ধি মোদের শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ॥
বীরচন্দ্র গোস্বামীর কিছু প্রভাব দেখিল।
নবাব সাহ মো সবারে আর কিছু না বলিল ॥
গোস্বামী জীউ বলিলেন অভিমান ত্যাগ কর।
যজ্ঞোপবীত তোমরা তিনে গঙ্গাকে দান কর।
এইকালে গোস্বামী জীউকে উক্ত কারণ জিজ্ঞাসিনু ॥
গোস্বামী প্রভুর মুখে সবিস্তার শুনিনু ॥
খোলাসা হইয়া সবে আসিলাম খড়দহে।
খড়দহের পশ্চিমভাগে সুরধনী বহে ॥
সুরধনীর পূর্ব্বভাগে কেশিয়া খড় ছিল।
শ্রীনিত্যানন্দ মুখাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইল ॥
তৎকালে অপূর্ব্ব গ্রাম ধনীজনে হৈল।
পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তথা বাস কৈল ॥
এসব বৃত্তান্ত মোরা পরে শুনিলাম তথা।
গ্রাম্যজনের মুখে শুনি বিশ্বাস হৈল কথা ॥
পরে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোঁসাই।
ইহারি কৃপার শিষ্য মোরা তিন ভাই ॥
মনোহর দাস বৈরাগী বলিয়া মোর নাম।
গুরু আজ্ঞায় বাঘনাপাড়া রামাইয়ের কাছে আসিলাম ॥

এথা হইতে খর্দ্দহেতে ঘোষপাড়ায় আসি।
তথা হইতে বৎসরেক বৃন্দাবন বাসী॥
এবেতে হইলাম আমি সোনামুখী বাসী।
অদ্য সম্প্রতি আপনাদের কৃপার প্রয়াসী॥
শ্যামচাঁদে দেখি মোর মনে ভক্তি হইল।
নামে মিল সেবাইৎ সহ মিত্রতা করিল॥
এই মোর পরিচয় শুনহ মহাজনগণ।
ভেকেতে বৈরাগী হইলাম পূর্ব্বেতে ব্রাহ্মণ॥
শুনি সর্ব্বে প্রেমানন্দে সাধু সাধু বলে।
এত ভক্তি কোথা পাবে ব্রাহ্মণ না হইলে।
ভেকাশ্রিত ভাবাশ্রিত প্রেমিক সুরসিক।
কৃষ্ণলীলা রসজ্ঞান অন্তরে অধিক॥
এইরূপ শুনিয়া আমি সাক্ষাৎ যে লিখি।
তর্জ্জার ছন্দেতে দ্বিজ কৃষ্ণধন তার সাক্ষী॥

মনোহর দাস বলে হৈল সন্ধ্যাকাল বোলে
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন মোর।
শ্যামচাঁদে করি স্তুতি নিত্য নিয়ম দিনপ্রতি
এই নিয়ম প্রতিদিন মোর॥
প্রণমিয়া শ্যামচাঁদে শীঘ্র আসি সভাসদে
নিবেদিব আর কিছু কথা।

শাস্ত্রেতে দেখিনু যথা গুরুমুখে পাইনু তথা
তাহা কিছু কহিব গূঢ় কথা।

ইহা বলি তাড়াতাড়ি শ্যামচাঁদে অষ্টাঙ্গ করি
মন্ত্র পড়েন যোড়হস্ত করি।

শুনেন সভাজন সবে মন্ত্র পড়েন মধুর রবে
শীঘ্র কার্য্য সমাধান করি।

আসি পুনঃ সভাপাশে বসিলেন অতি সন্তোষে
সভাসদে বলেন হরি হরি।

মনোহর দাস তখন যোড়হস্তে কহে কথন
বৈরাগী শব্দের অর্থ যে বিবরি।

নমো নমঃ শ্যামচন্দ্র মুরলীবর ধারিণে।
নমো নমঃ হে গোবিন্দ ভক্তমঙ্গল কারিণে। ১

নমো নমঃ সর্ব্বজন হৃদয় তমো নাশিনে।
নমো নমঃ শ্রীহরয়ে শ্রীরাধাপতয়ে নমঃ। ২

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। ৩
হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।

গোপেশ গোপিকানাথ রাধাকান্ত নমস্তুতে ॥ ৪

নমো মঙ্গল রূপায় দ্বিজ মঙ্গল কারিণে।
নমো ভক্ত রক্ষকায় নমস্তাপ বিনাশিনে ।৫

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥ ৬

তবে মনোহর দাস বৈরাগী আখ্যান।
বিবরিয়া কহে কিছু পুরাণ ব্যাখ্যান ॥
তিনটী অক্ষরে হয় যে বৈরাগী শব্দ।
নেড়ানেড়ী আউল বাউল এই শব্দে জব্দ ॥

যথা শাম্বপুরাণে—

বৈভবো নাস্তি নাস্তীচ্ছা বৈকুণ্ঠান্তে সদা গতিঃ।
বৈদিকাদি ক্রিয়া নাস্তি বৈকার স্তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ ১

রাজকার্য্য পরিত্যজ্য রাগ কৃষ্ণপদে সদা।
রাধাকৃষ্ণ পদে ভক্তি রাকার স্তৎ নিগদ্যতে। ২

গীতকর্ত্তা গিরিধারী তদ্ধ্যানে নিরন্তরঃ।
গীতবাদ্যে সদানৃত্য গীকারস্তস্য লক্ষণঃ ॥ ৩

যথা সার সমুচ্চয়ে—

বৈরাগীনং বিনিন্দন্তি যে নরা স্তেচপাতকী।
যদি গঙ্গাতীরং যান্তি গঙ্গাপিতাম্রপশ্যতি ॥ ৪

বৈষ্ণব নিন্দুক যদি গঙ্গাতীরে যায়।
সেই নিন্দুকে গঙ্গাদেবী ফিরিয়া না চায় ॥ ৫

শুনি সভা ভাঙ্গি সবে নিজ গৃহে চলি যায়।
পথিমধ্যে সুপ্রশংসা মনোহর দাসের গুণ গায় ॥
সভা মধ্যে আরও কিছু অন্য ব্যক্তি যে আছিল।
ইহারা সাধুর বাক্য সকলেই শুনিল জানিল ॥
কৃষ্ণধন চট্টরাজ আমিহ জানিয়া শুনিয়া।
লিখিলাম তৎকালের কথা আশ্চর্য্য মানিয়া ॥
কিছু দিন পরে পুনঃ এক আশ্চর্য্য কথা যে শুনহ।
মহাপুরুষ দিগ্বিজয়ী মনোহর দাসকে জানিহ ॥

——

মনোহর অধিকারী তার কন্যা অতি সুন্দরী
বিবাহের যোগ্যা যে হইল।
সৎপাত্র খুঁজি খুঁজি যাহা কিছু অর্থ পুঁজি
বিবাহেতে খরচ করিল ॥

বরযাত্রী আইল যত গণনা কে করে কত
পরদিন ভোজ্য মাংস চাহে।
শুনি সাধু মনোহর কহে ছুটি যুক্তি কর
ও কার্য্য এ গোস্বামী বাড়ী নহে॥
বরযাত্রী পুনঃ তবে অবশ্য যে দিতে হবে
ইহা বলি কহে পুনঃ পুনঃ।
তথা মনোহর দাস কহেন দন্তে করি ঘাস
বহু মৃগ আনিব আমি শুন॥
তাহা দেখি যাহা বিধি নিজ হস্তে কর যদি
তাহাই করি নিজ হাতে।
ইহা কহি মনোহর দাস বৈরাগী বটেশ্বর
সুমধুর তান ছাড়িল যে পথে॥
তান শুনি হরিণীগণ আসি জুটে ততক্ষণ
এই তান্ আসাবরী হয়।
দশ বার হরিণী তথা মোহ হইয়া পড়ে তথা
দেখি সবে বিস্ময় ভাবয়॥
মনোহর দাস বটে আসিল যে মৃগ বটে
বিহিত বিধান সবে কয়।

দেখি মাংস ভোজী যত বরযাত্রী ছিল যত
সবে বলে ঠাকুর ক্ষমা কর ॥
ক্ষমা কর মহাজন মো সবার কুবচন
মাংস লাগি জীব না মারিব ।
অদ্যাবধি হইতে মোরা মৎস্য মাংস হলাম ছাড়া
নিরামিষ ভোজন করিব ॥
শুনি মনোহর দাস মৃদু মৃদু কহেন তায়
কেন সবে এ কথা কহিছ ।
শক্তি বুদ্ধি নাহি মোর কুবুদ্ধিতে হলাম ভোর
ক্ষমা কথা আমারে কহিছ ॥
শ্যামচাঁদের ইচ্ছা যাহা অবশ্য হইবে তাহা
ইহা সবে সত্য করি জান ।
বিবাহ কার্য্য শেষ করি সবে বল হরি হরি
শ্যামচাঁদে কিছু কিছু মান ॥
ঘরজামতা হবে জামতা তোমারা কি শুন নাই তা
অধিকারী জামাতার পুত্র হবে ।
বহুকাল রহিবে বংশ মোর বাক্যে হবে না ধ্বংস
তাহারা এই শ্যামচাঁদে সেবিবে ॥

চট্টরাজ কৃষ্ণধন ত্রিপদী ছন্দে বর্ণন
কহিল যে উপস্থিত কালে।
অত্র শ্যামচাঁদের প্রসাদ যদি খাও এক গ্রাস
ধন্য হই আমরা যে সকলে॥

গ্রামের গোয়ালা এক মাঠে গাভী লয়।
গোয়ালার গাভী যে গোটা বত্রিশ হয়॥
বাছুরী রাখিয়া ঘরে গাভী লইয়া যায়।
গৃহে বৎস রহে তাহারা ওম্বা ওম্বা কয়॥
গোয়ালা আনিয়া গাভী দুগ্ধ দুহিল।
বাছুরীর কষ্ট হয় ঘোষ না খাইল।
ইহা বিচারিয়া গেল মনোহর দাস ঠাকুরের কাছে।
সুবচনে ঘোষ তথা বৈরাগীকে পুঁছে॥
গাভী লইয়া বনে যাই চরাই প্রতিদিন।
বাছুরী না খায় ঘাস দেহ হইল ক্ষীণ॥
ইহার প্রতিকার কিছু কহত ঠাকুর।
শুনি দাস মনোহর কহিল প্রচুর॥
কল্য হইতে বাছুরী গাভী বনে লইয়া যাবে।
বনে তৃণ বাছুরী গাভী উভয়েতে খাবে॥

দুগ্ধ নাহি খাবে জান আমারি বচনে।
প্রতিদিন অর্দ্ধ সের দুগ্ধ দিবে শ্যামচাঁদের স্থানে॥
ইহা শুনি পরদিন বাছুরী গাভী দুহিয়া লইল।
পরে উভয়েরে চরাইতে চরাইতে বনে গেল॥
লক্ষ্য রাখে বাছুরী দুগ্ধ খায় কিনা খায়।
এমৎভাবে বনপ্রান্তে গাভীরে চরায়॥
বৈকালী বেলাতে ঘোষ লইয়া ধনু বৎস।
গৃহেতে আসিল ঘোষ মনে মহা হর্ষ॥
গাভী দুহি দুগ্ধ কিছু লইয়া যায় তবে।
মনে মনে ভাবে ঘোষ প্রতিদিন কি হবে।
অর্দ্ধ সের দুগ্ধ লইয়া বৈরাগীকে দিল।
ঘোষ ভাবে মনে মনে তাহা বৈরাগী জানিল॥
বলেন সাধু ঘোষ তুমি যাহা ভাবিছ মনে।
প্রতিদিন বাছুরী দুগ্ধ না খাইবে বনে॥
তোমার এই বংশ ঘোষ যতদিন রবে।
ধেনু বৎস এক স্থানে বনে লইয়া যাবে॥
বাছুরী না খাইবে দুগ্ধ নিশ্চয় জানিবে।
কিন্তু প্রতিদিন দুগ্ধ শ্যামচাঁদে দিবে॥

ইত্যাদি জানিয়া চট্টরাজ কৃষ্ণধন।
পয়ারের ছন্দেতে সর্ব্ব করিল বর্ণন॥

বৈরাগী শ্রীমনোহর দাস মধ্যাহ্ন সিনান করি।
কৌপীন বহির্ব্বাস সুখান পন্থায় উপরি॥
হেনকালে আকাশেতে মেঘের উদ্‌গম।
ঘুর্ণা বায়ু মহাপ্রবল শব্দ ঝমাঝম॥
উড়াইল ঘুর্ণাবায়ু কৌপীন বহির্ব্বাস।
তাহা দেখি মনোহর ঠাকুর হইল উদাস॥
বহির্ব্বাস কৌপীন তবে বহু উর্দ্ধেতে উঠিল।
ঘুর্ণাবায়ু লয়ে কোন বনেতে ফেলিল॥
কৌপীনাদি না পাইয়া ঠাকুর হতাশ হইয়া।
কৌপীন চাহেন তন্তুবায় ঘরে ঘরে গিয়া॥
তন্তুবায় বলে সকলে শুন মহাশয়।
দশহাত টানা করি দশ হাতে কাপড় হয়॥
বিক্রি করি টাকা পাই আমরাও পরিধান করি।
কৌপীন টুকরা ইহা আমারা কেমন করে করি।
ক্রমে ক্রমে সোনামুখীর যত তন্তুবায়।

বৈরাগীকে দেখিয়া সর্ব্বে আসিল তথায়।
সর্ব্বে কহে মহাশয় কৌপীন নাহি এবে।
বহির্ব্বাস দশহাতিতে আটখানা হবে।
আড়াই হস্ত লম্বা কৌপীন আর বহির্ব্বাস।
কটি বেড়া এই বস্ত্র মোদের গৃহেতে নৈরাশ।
ইতি মধ্যে এক ভক্ত দিল আড়াই হস্ত বস্ত্র।
ডোর কোপীন বহির্ব্বাস সাধু ফাড়েন অতি ত্রাস্ত।
ইহা পাইয়া বৈরাগী শ্রীমনোহর দাস।
সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কয়েন প্রকাশ।
শুন শুন ভক্ত সবে আমারি বচন।
দশহস্ত লম্বা টানা করিবে রচন।
যত টানো তত কশ উক্ত টানা যে বাড়িবে।
দশহস্ত মাপি বস্ত্র অর্দ্ধ হস্ত যে বাড়িবে।
সেই অর্দ্ধহস্ত আড়ে লম্বার আড়াই হাত।
বিক্রয়ের পূর্বে মাপি করিবে আত্মসাৎ।
পরে মোকে বা যদিদেখ দেবস্থান।
অর্পণ করিবে সবে এইতো বিধান।

দ্বিজ কৃষ্ণধন চট্টরাজ ইহা যে জানিল।
পয়ারের ছন্দে কিছু বর্ণনা রচিল॥

শ্রীশ্যামচাঁদ বিগ্রহ ভক্তে করেন অনুগ্রহ
শুন শুন ভক্ত হিতকর।
ইহার সেবক যত ঠাকুরের কার্য্যে রত
দুগ্ধবতী গাভী নিরন্তর।
যত্ন করি রাখে গৃহে বাহিরে গেলে মন দহে
নব তৃণ যোগায় সকলে।
দৈবগতি একদিন গাভী হইল বন্ধন হীন
বন মধ্যে দ্রুতগতি চলে।
না দেখিল কোন জন গাভীর হৈল অন্য মন
বহু দূর চলিয়া যে গেল
কিন্তু বাছুরী গৃহে রহে মায়ে না দেখে নেত্রে জল বহে
দুগ্ধ খাবার সময় আসিল।
দোহালা আসিয়া মিলে গাভী না দেখে গোয়ালে
দামগণে ডাকে ঘণে ঘন।
এই শব্দ শুনি যবে মনোহর দাস পোঁছে তবে
ভাবেন গাভী গেল দূর বন।

অন্তরে জানিলেন দাস গাভী বনে খায় ঘাস
শ্যামচাঁদে আবেদন করিল।
মন্দির সম্মুখে আসি নিবেদয়ে হাসি হাসি
শ্যামচাঁদ গাভী আনিতে চল।
গোকুলে নন্দের গৃহে লক্ষ লক্ষ ধেনু রহে
তাহা তুমি গোষ্ঠে চরাইতে।
বৈকালে আসিয়া গৃহে নিজে কিছু দুগ্ধ দুহে
মা যশোদায় হস্তে যে অর্পিতে।
দুগ্ধ সঞ্চয় সময় এবে গাভী কোথা গেল তবে
তোমার ভোগের সময় হইল।
ইহা জানাইয়া সাধু হাস্য ছটা যেন বিধু
শ্যাম চাঁদের বদনে দেখিল।
ভোগের আয়োজনকালে গাভী না আসিল বলে
ভোগ কার্য্যের সময় ভঙ্গ হৈল।
হেন কালে রৌদ্র ভয়ে গাভী আসি ডাকে দ্বারে
দোহাল তথা উপস্থিত ছিল।
জানি দাস মনোহর মন্দিরে যাই সত্বর
শ্যামচাঁদে চামর ঢলায়।
আপাদ মস্তক দেখেন নূপুর শূন্য চরণ দেখেন
অধিকারী মনোহরে কয়।

দেখ মিত্র কি আশ্চর্য্য ইহ শ্যামচাঁদের কার্য্য
গাভী আন্তে গিয়াছিলেন বন ।
খুঁজি খুঁজি গাভী কোথা নূপুর ফেলেছেন কোথা
এযে দেখি শূণ্য শ্রীচরণ ।
ভোগের কার্য্য সমাধিয়া ঠাকুরে শয়ন দিয়া
বৈকালেতে যোগাযোগ করি ।
মনোহর দাস বৈরাগী কোথা নূপুর দয়া মাগি
শ্যামচাঁদে কহে কর যোড়ি ।
যদি তথা শূণ্য কথা ধ্যান যোগে নূপুর যথা
তৃণ আচ্ছাদনে নূপুর জানি ।
তবে দাস মনোহর অধিকারী মনোহর
সঙ্গে আর জন সাত আনি ।
নূপুর আনিতে যায় পথে লোক জিজ্ঞাসয়
সংক্ষেপেতে কিছু প্রকাশয় ।
তাহা শুনি ক্রমে ক্রমে বহু ভক্ত আসি ক্রমে
নূপুর আনিতে সবে যায় ।
সবে মেলি যথা নূপুর যাইয়া হইল পুর
দাস মনোহরে সবে কয় ।

এই ভূমি শ্যামচাঁদের নূপুর কোথায় বল মোদের
শুনি সাধু বলে ঐ তৃণ মধ্যে হয়।
তৃণ গুচ্ছ বহু আছে খুঁজে সর্ব্ব কাছে কাছে
অকস্মাৎ নূপুর মিলয়।
আসিয়া গ্রামের ভিতর ইহা সব প্রকাশে সত্বর
গ্রামবাসী বহুত মিলয়।
নূপুর ফেলা ভূমি বলি অদ্যাবধি লোক বুলিল
সর্ব্বত্রেতে প্রকাশ হইল।
চট্টরাজ কৃষ্ণধন দেখি সত্য করি বর্ণন
ত্রিপদী ছন্দেতে লিখিল।

——

নূপুর খুঁজিল সাধু আরোপেতে বসি।
এবৃত্তান্ত সর্ব্বজনে কহেত প্রকাশি।
গ্রাম্যজনে সবে জানিল এ বৃত্তান্ত।
আর কত শত কার্য্য হইল বিদিত।
ক্রমে ক্রমে শ্যামচাঁদের কত মত সেবা।
করিতে লাগিল সাধু মনে হয় যেবা।
সেবা সাধনে সাধুর দিন যায় বয়ে।
বার্দ্ধক্য আসিল এবে মনে বিচারিয়ে।

যেখানেতে শ্যামচাঁদের রাসযজ্ঞ হয়।
সেই ত নির্জ্জন স্থান মনে বিচারয় ॥
অষ্টাশিতি বৎসর এবে বয়ক্রম হৈল।
সমাধি বসিব বলি কার্য্য বিচারিল ॥
অপরাহ্নকালে একদিন কুম্ভকারেরে বোলায়।
কুম্ভকার আসি তথা প্রণমিল পায়।
কুম্ভকারে কহেন সাধু এক পাৎনা গঠিবে ॥
সার্দ্ধ এক হস্ত তার মধ্যদেশ হবে ॥
মুখ বড় তাহার ভিতরে আমি বসিতে পারিব।
শেষ সংবাদ পাইলে আমি নিজে যে আনিব ॥
ইহা শুনি কুম্ভকার নিজ গৃহে গেল।
কার্য্য শেষ করি পাল সাধুকে সংবাদিল ॥
তবে একদিন দাস বৈরাগী যাইয়া পালের বাড়ী।
পাৎনা লইয়া এলেন নিজ স্কন্ধে করি ॥
সবে জিজ্ঞাসয় ইথে কি কার্য্য হইবে।
দাস বৈরাগী বলে মোর সমাধিতে দিবে ॥
ইহা শুনি সর্ব্বজন করে হাহাকার।
কি কথা বলিলেন ঠাকুর না বলিহ আর ॥
পরে সাধু গৃহে আসি পাৎনা রাখিল।

সন্ধ্যাকালে ভব্য সহ কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥
পহিলে গৌরাঙ্গ গুণ আরতি গাহিলা।
পরে রাধা দেবীর আরতী কীর্ত্তন রচিল ॥

বসন্ত গুর্জ্জরী রাগ

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরত্তি যাও বলিহারী ॥
পাট পট্টাম্বর উড়ে নীল শারী।
সিঁথীপর সিন্দুর শোভা অতি ভারী ॥
বেশ বনায়ত প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী ॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি ॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতাহি।
আরতি করতঁহি ললিতা সুন্দরী ॥
নব নব ব্রজবধু মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে।
রাধাপদ পঙ্কজ ভকতঁহি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা ॥

আরতি পরে অতি উচ্চৈঃস্বরে
রাগিনী আরম্ভ করি।
নৃত্য আরম্ভিল উদ্দণ্ড হইল
শ্রোতা বলে হরি হরি।
ইহা সমাধিয়া সুরস ধরিয়া
শ্যামচাঁদ গুণ গায়।
এ রস গাহিতে আনন্দ ভরেতে
ঢলি ঢলি পড়ি যায়।
কখন হাস্য কখন দাস্য
কখন নয়নে ধারা।
কখন কম্প কখন ঝম্প
গদগদ কণ্ঠস্বরাঃ।
বহুক্ষণ ধরি কীর্ত্তন সম্বরি
ভক্তগণে বলেন শুন।
আগত দিবসে মহোৎসব রসে
তোমরা সাহায্য পুনঃ।
করিবে নিশ্চয় ইহা মনে লয়
প্রতিবর্ষ পুনঃ পুনঃ।
সেই তিথি জান শ্রীরামনবমী মান

ইহা হয় উপবাস দিন ॥

পরদিনে তবে বৈষ্ণব ভোজন হবে

তাহার যোগাড় করি।

তিন দিন ব্যাপী এখানে সেখানে

যেখানে সমাধি ধরি।

ইহাই আদেশ শুনি ভব্য শেষ

সকলে কাঁদিয়া উঠে।

হাহাঃ হুহুঃ করি কি বলিলেন মরি

উচ্চৈঃস্বরে সবে রটে।

পরে মনোহর দাস মৃদুস্বর

ধীরে ধীরে কিছু কয় ॥

হইল বয়স দেহটী বিরস

নির্জ্জনে ভজন হয়।

কল্য আসিবে কীর্ত্তন বসিবে

শ্রীশ্যামচাঁদের দোল।

পরেই যাইব কীর্ত্তনে করিয়ে

যেখানে সমাধি স্থল।

কল্য রাম জন্ম তিথি মহাপুণ্য

ভজনে বসিব মুই।

সমাধি স্থলে যে যাহা মানিবে

অবশ্য হইবে জয়ী।

ইহা হয় মলঝাপ, আর পয়ার ছন্দ।

চট্টরাজ কৃষ্ণধন, লিখে এসব প্রবন্ধ॥

পরদিন সুদিন বৈকালে আসি সর্ব্বমুখ্যজন।

আদেশানুসারে শ্রীশ্যাম অঙ্গনে আরম্ভিল যে কীর্ত্তন॥

কীর্ত্তন শেষে মনোহর দাসে কহে যে কিছু কথা।

আজি শুভদিন আমার সুদিন রাম জন্মদিন যথা॥

তোমরা মুখ্যগণ তোমরা ভক্তজন আমি যে বিদায় চাই।

সবে মিলে দয়া কর অদ্য সমাধিতে যাই॥

আর কেহ মোরে এ স্থূল দেহটী না পাবে দেখিতে জান।

সমাধি স্থলে চিঁড়ে মাল্‌সা দিলে রাখিব তাহার মান॥

যেজন আতুর রোগাক্রান্ত জন সমাধিতে হত্যা দিবে।

সমাধিস্থলে মানস করিলে মনস্কাম পুর্ণ হবে॥

ইহা শুনি সবে হাহাকার রবে কান্দিয়া কান্দিয়া কহে।

ঠাকুর দয়াময় হইও সদয় তব চরণে যেন মন রহে॥

সোনামুখী গ্রামবাসী সভ্য মুখ্য আর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।

বৈষ্ণব সমাধি হইবে দেখি নাই অদ্য দেখিব কেমন॥

বহু লোক শ্যামচাঁদের মন্দিরে অঙ্গনে আসিল।
মনোহর দাস বৈরাগী যোড়হস্তে সবে প্রণমিল॥
দাস বৈরাগীর দৈন্য দশা দেখি সবে কাঁদিতে লাগিল।
তাহাদিগকে আশ্বাসিয়া শান্তি বচন বলিতে লাগিল॥
শুন শুন মহাশয় তব্য মুখ্য গ্রামের দেবতা ব্রাহ্মণ।
সবে দয়া কর মোরে পাই যেন শ্রীশ্যামচাঁদের চরণ॥
নয়নেতে বহে নীর দ্রুতবেগে শ্যামচাঁদের মন্দির।
চারি পরিক্রমা করি সাধু নিজ মন কৈল স্থির॥
পঞ্চবিংশ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সাধিল ক্রমে মনে।
পরে এক অষ্টাঙ্গ কৈলেন জীব ব্রহ্মজ্ঞানে॥
মুখে বলেন ইদংব্রহ্ম ইদংব্রহ্ম হইতে হয়।
বেদশ ব্র বেদপাত্র বেদভ্যাসেতে করিল নির্ণয়॥
ইহা শুনি পণ্ডিতগণ মনোবিচারে স্তব্ধ রহে।
সর্ব্বজনের মানস তখন একই ভাবে নেত্রে জল বহে॥
তৎকালে শ্রীমনোহর দাস মৃৎপাত্র বাহির করিল।
আমি কৃষ্ণধন দ্বিজ স্কন্ধে করি সর্ব্ব সঙ্গেতে চলিল॥
অধিকারী মনোহর আর ধনীরাম চট্টোপাধী।
নৃসিংহ মুখুজ্যে পণ্ডিত গঙ্গারাম ধীক্ষ বৈষ্ণী॥
আর অন্য কেহ মৃদঙ্গ কেহ কাঁসর কেহত নিশান।

করতাল খরতাল শঙ্খ কেহ বাদ্য করে শৃঙ্গা বিশান ॥

কীর্ত্তনীয়াগণ এই বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥
সুকণ্ঠ কীর্ত্তন ধ্বনি সর্ব্বজনের মিলয়।
তার সহ সর্ব্ববাদ্য ধ্বনি হইল যে লয় ।
বিশ বাইশ শঙ্খধ্বনি অপূর্ব্ব ঘোষণা।
কীর্ত্তনাদি ধ্বনি তাহাতে হইল যোজনা ॥
মহা তুমুল তালে হয় সবার নৃত্যানন্দ।
তার সঙ্গে উলুধ্বনি আনন্দ প্রবন্ধ ॥
কীর্ত্তনের মধ্যে নৃত্য করেন মনোহর ঠাকুর।
সোনার পুতুলী যেন নাচয়ে প্রচুর ॥
নগরের পন্থা দিয়া কীর্ত্তন চলি যায়।
স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধ পাছু পাছু ধায় ॥
এই ভাবে যোগ করি কীর্ত্তন চলিল।
ক্রমে ক্রমে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানেতে পৌছিল ॥
যথা শ্যামচাঁদের হয় সুন্দর বাসভবন।
তথা যাইয়া স্থিত হইল কীর্ত্তনীয়াগণ ॥

তথা যাইয়া কীর্ত্তন রাখি সমাধি স্থান দেখে।
হায় কি করি কবে করিলেন জিজ্ঞাসর সুখে ॥
মনোহর দাস বৈরাগী দেখায় সমাধি আসন।
পূর্ব্বেতে সাব্যস্ত ছিল সকল আসন বসন ॥
ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস আর ভিক্ষার ঝুলি।
পরিধান করি বৈসেন স্কন্ধে লইয়া ঝুলি ॥
সমাধির স্থান গর্ত্ত হয় দেড়হস্ত পরিমান।
নিম্নে পাথর স্নিগ্ধ তাহার ভিত্তেতেও সমান ॥
মনোহর দাস বৈরাগী সর্ব্বজনে সন্তোষিয়া।
প্রদক্ষিণ কৈল গর্ত্ত হরিধ্বনি দিয়া ॥
আসনে বসিলেন তখন উত্তর মুখেতে।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ নাম বলেন বলিতে ॥
ঐ নাম ধ্বনি শঙ্খ ধ্বনি দুই এক মানি।
তৎকালেতে চমকি উঠেন যেন দিনমণি ॥
শুনিতে শুনিতে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিশ্চল হইল।
মনোহর অধিকারী তুলসীমালা সাধুর গলাতে অর্পিল ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে।
ইচ্ছা মৃত্যু কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মদেবের সন্মুখেতে ভনে ॥

উত্তম ভক্ত ভীষ্মের নির্য্যাণ অপূর্ব্ব কথন।
স্বয়ং কৃষ্ণ আসি দিলেন যুগল দরশন ॥
উত্তম ভক্তের হয় প্রভুর সঙ্গেতে গমন।
প্রভু লইয়া গিয়া করেন মহাযোগপীঠে মিলন ॥
তত্ত্বসন্দর্ভে ইহা জীব গোস্বামী বিবরিয়া।
লিখিয়াছেন পুরাণ বিধি শাস্ত্র বিচারিয়া ॥
শাস্ত্র সঙ্গত হয় প্রকৃত বৈষ্ণবের চৌষট্টি অঙ্গের সাধন।
যথার্থ এই দেখিল'ম সার্থক মোদের এপাপ জীবন ॥
বৈষ্ণব আছিল মোদের এ সোনামুখী গ্রামের ভিতর।
সাধন ভজন সমাধিয়া চলিলেন নিত্য যোগপীঠের ভিতর ॥
এতৎকালে কৃষ্ণধন চট্টরাজ সাধুর ইঙ্গিত পাইয়া
পাৎনা লইয়া যত্নকরি দিল উপরে আচ্ছাদিয়া ॥
সবে কৃষ্ণকীর্ত্তন করে চৌদিক ঘেরিয়া।
হরে কৃষ্ণ হরে র'ম র'ধে গোবিন্দ বলিয়া।
আড়'ই পদী ছন্দে আর পয়ারের তানে।
রচিল যে তিরোভাব দাস মনোহর ঠাকুরের মানে।
মুই কৃষ্ণধন চট্টরাজ বৈরাগীকে কিঞ্চিৎ সেবিল ॥
তাঁর কৃপাবলে তাঁহার এ সর্ব্ব চরিত্র বর্ণিল।

এবে সর্ব্বে শুন তবে সমাধির নিয়ম পালন।
এসব শুনিলে জীবের হয় পাপ প্রক্ষালন।

——

সমাধি দেখিয়া সবে মন সুস্থভাবে ক্রন্দন সম্বরিল।
আমি কৃষ্ণধন চট্টরাজ তখন ঝুড়ি কোদাল আনিতে বলিল।
বহু মৃত্তিকা আনি সমাধি উপরি আর চারিদিগে আচ্ছাদিবে।
নতুবা বিপদ নাহি জনপদ হেথা কেহ রক্ষা না করিতে পারিবে।
চারি কোনা বেদী প্রায় মাটি দিয়া আচ্ছাদন করি।
গোময় আর জল দিয়া সর্ব্ব মৃত্তিকা লেপহ সমান করি।
বৈরাগীর প্রীতে সকলে মিলিয়া একবার মুখে বল হরি হরি।
বৈষ্ণবের সেবা না করিলে শুন এ ভব সমুদ্র না তরি।
সন্ধ্যা হইল এবে রাত্রি ত হইবে অন্য কেন মোরা ডরি।
বহুলোক লাগি গেল দুঘণ্টা মধ্যেতে যে কার্য্য সমাধা করি।
নয় ঘটিকার ঘরে কালে শ্যামচাঁদের চিঁড়া ভোগে যে আসিল।
অধিকারী মনোহর আর ব্রাহ্মণ ভোগ দিবার প্রণালী ভাবিল।
এতন্মধ্যে ছিল কিছু বৈষ্ণব তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ
বৈষ্ণবের পরিণাম জ্ঞান তাহা তাঁদের আছে নিরীক্ষণ।
মনোহরের আদ্যক্ষরে মণিমঞ্জরী বলিয়া মন্ত্র করিল গঠন।
শ্রীমণিমঞ্জরী দেব্যৈ নমঃ বলি প্রসাদ করিল অর্পণ।

সমাধি ভিতর হইতে সাধুর হুঙ্কার উঠিল।
হুঙ্কার শব্দ শুনিয়া কেহ কেহ কিঞ্চিৎ ভয় যে পাইল॥
উপস্থিত ব্রাহ্মান পণ্ডিত তান্ত্রিক বৈষ্ণব আছিল।
হুঙ্কারের অর্থ কিছু বুঝি প্রসাদ অর্পণ নিষেধ করিল॥
অদ্য হয় রাম নবমী তিথি রামের জন্ম বৈষ্ণবের উপবাস।
অতএব নিবেদিত কোন দ্রব্য বৈষ্ণবে না করিবেন গ্রাস॥
পরে সেই প্রসাদ লইল যে জন ব্রত না করিল।
সেইজন সেই প্রসাদ সর্ব্বস্থানে মাগিয়া লইল॥
পরে যুক্তি করি দুই মশাল জ্বালি নিশা ভোর পর্যন্ত।
দশ বারোজন মুখ্য জাগিল তথা নির্ভয় সন্তঃ॥
আর সর্ব্বজন সাধুর গুণেতে মগ্ন হইয়া।
দশ ঘটিকায় গৃহে যায় সাধুর গুণ বিচারিয়া॥
পরদিন যুক্ত করি পঞ্চবিংশ ত্রিংশ জনে।
বংশ আর শালপত্র দিয়া কৈল গৃহ বিরচনে॥
ক্রমে ক্রমে মানসীয় ভোগ আসিতে লাগিল।
অধিকারী মনোহর ব্রাহ্মণ রাখি সমাধা করিল॥
মাল্‌সার চিঁড়া ভোগ কালে গ্রামের বালক আসি মিলে।
সেথা হইতে যায় না ফিরে কিছু চিঁড়া প্রসাদ না দিলে॥

মনোহর দাস বৈরাগীর এই গুণ বা জীবন চরিত্র।
দ্বিজ কৃষ্ণধন চট্টরাজ লিখিয়া হইল পবিত্র॥
পরে সর্বে গৃহে বসি মুখ্য জনে বিচার করিলাম।
তিনদিন পরে চিঁড়া মহোৎসব আরম্ভিলাম॥
তিন দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ আর গ্রাম্যজন।
দীন দারিদ্র্য কত শত কৈল যে চিঁড়া ভক্ষণ॥
গ্রাম্য জনে জানিল মানিল তাঁহারি আদেশ।
বর্ষ বর্ষ রামনবমীর পর তিন মহোৎসব শেষ॥
সন এগার শত পঁয়ত্রিশ সালে মনোহর দাসের নির্য্যাণ।
লভিলেন বৃন্দাবনে মহাযোগপীঠে শুভস্থান॥
অনঙ্গ মঞ্জরীর যূথে মণিমঞ্জরী আখ্যান।
অবশ্যই পাইবেন শাস্ত্রে ইহাইতো বিধান॥

শ্রীবৈষ্ণবচরণদাস মহান্তের উপদেশ ও আবেগ বর্ণনা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত কিঞ্চিৎ মুই করিব বর্ণনা।
শুন শুন মহাজনগণ কিছু না কর ভাবনা॥

সবৈষ্ণব দেখ খোঁজে তিনি বৈষ্ণব ঠাকুর।
তাঁহার দ্বারে যাই হও তাঁহার এঁঠু খাবার কুকুর॥
অধুনা হইল বৈষ্ণবের চাতুরী বিশেষ।
ভেকাশ্রমে গৃহীগণে করেন ব্যভিচারীতে নানা দ্বেষ।
বৈরাগীর চরিত্র শুনি বৈরাগী যে হয়।
ব্যভিচারী দোষে সেই সদা না পড়য়॥
বৈরাগী হইয়া করে ব্যভিচারী দোষ।
শিব দুর্গা তাহার প্রতি বড়ই অসন্তোষ॥
সঙ্গত্যাগ সদাচার চৌর্যা ট্ট অঙ্গ সাধন।
ইহাই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বৈরাগী লক্ষণ॥
তিলক তুলসী মালা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা।
পাঁচ বা সপ্তম গৃহে করিবেক ভিক্ষা॥
হরিনাম কৃষ্ণনাম সদাই জপিবে।
বৃক্ষসম সহ্যগুণ পিপসার জল না মাগিবে॥
এই প্রকার হয় দাস মনোহর বৈরাগী।
কেহ বলে দাস মনোহর কেহ কহে যে বৈরাগী॥
কেহ বলে মনোহর ঠাকুর কেহ বা বলে বাবাজী।
কেহ বলে ফুৎকরিয়া বাবাজী মহারাজী॥
গৌড় দেশে মনোহর বাবাজীর মহিমা প্রচুর।

কেহ বলে মনোহর দাস বৈরাগী ঠাকুর ॥
ত্রিপদী ছন্দেতে পয়ার হইল বর্ণন।
আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন সর্ব্বজন ॥

বর্ষাকালে বৃষ্টিজলে বালুকা ভাসিয়ে চলে
ঢালু স্থান সমাধি আছিল।
বেদী বাঁধা মৃত্তিকায় জলস্রোতে কাটি যায়
সমাধিতে বালুকা চাপিল ॥
ধনীরাম চট্টোপাধ্যায় তাহা মুখ্যগণে কয়
মিলি সবে পরামর্শ কৈল।
পরে অর্থ সঞ্চিয়া শুভক্ষণে ভিত্তি দিয়া
মন্দিরের কার্য্য আরম্ভিল।
অনুমান ভিত্তি খুঁড়ে মৎপাত্র ভগ্ন পড়ে
দেখি সবে অতি ব্যস্ত হইল।
আচ্ছাদিত মৃৎপাত্র অর্দ্ধ ভগ্নে সাধুর গাত্রঃ
দেখি সবে আশ্চর্য্য হইল ॥
এক বর্ষ কিছু না খায় কলে র জীর্ণ না হয়
শ্রীঅঙ্গেতে জ্যোতি প্রকাশিল।
এই কথা শুনি শুনি তথাতে আসিল প্রাণী
ভব্যভব্য লোকেতে দেখিল।

আশ্চর্য্য হইয়া সবে মৃৎপাত্র আনিয়া তবে

পুনর্ব্বার আচ্ছাদন করিল।

বহু ভক্ত লাগি শীঘ্র মন্দির রচিল দীর্ঘ

চুণ বালুতে সুন্দর আচ্ছাদিল।

কিছুকাল পরে তবে নাট্যমন্দির হইল যবে

পুনঃ জীর্ণ মন্দির সংস্কার।

পরে উত্তরের দ্বার পরেতে পূর্ব্বের দ্বার

ক্রমে ক্রমে রচিল বিস্তর।

রাজেন্দ্র রাধিকা বাবু সাবজজ বরদা বাবু

আর বানোয়ারী লাল চট্ট।

দ্বিতল ভবন যথা সাধু বৈষ্ণব রবে তথা

নির্ম্মাইল ঈশান কোণের ঘট্ট।

ইহা কয় একটি পুকুর সিনান করিতেন মনোহর ঠাকুর

তাহার জল অতীব নির্ম্মল।

আমি বৈষ্ণব চরণ দাস সোনামুখীতে ছয় মাস

রহি কিছু বিদ্যা অভ্যাসিল।

গ্রাম্যজনের কৃপায় এবে জানি শুনি লিখি তবে

পঞ্চভক্তের সমক্ষে ডারিল

গ্রামের ভব্য ভব্য মিলে সমাধি সেবায় যুক্তি বলে
মনোহর ঠাকুরের উৎসব স্থাপিল ॥
সোনামুখী ভক্তগণের বৈষ্ণবভক্তির নিরীক্ষণের
ভাব দেখি আশ্চার্য্য হইল।
দূরে রহি মুই পাপী আর না যাইলাম ঝাঁপি
কিন্তু মোর মনেতে জাগিল ॥
ইত্যাদি হয় আধুনিক বারশত চুয়াত্তীক
কিছু তার পূর্ব্বে আর পরে যে হইল।
মনে আছে সত্য বটে তথাকার ভক্তেও রটে
জানিলাম সর্ব্ব সত্য যে মিলিল ॥
আর এক পড়িল মনে রাস পূর্ণিমার শুভক্ষণে
শ্যামচাঁদ রাস সমাধিয়া।
অগ্রেতে সমাধি স্থান মনোহর দাসের ভবনে
শ্যামচাঁদ পূজা ভোগ দিয়া ॥
ঘট্ট বাঁধা পুকুরেতে জলকেলী সমাধিতে
শ্যামচাঁদ অগ্রসর হন।
পরে শ্রীপ্যারীজী সহ নিজ মন্দিরে বহু বহু
ভক্তসঙ্গে করেন গমন ॥

এই সোনামুখী গ্রাম তীর্থ সম সম্মান

শ্যামচাঁদ আর বৈষ্ণব ভক্ত।

এথা যে সর্ব্বভক্তগণি তন্মধ্যে বৈষ্ণব চুড়ামণি

মনোহর দাস যথা ব্যক্ত॥

বর্ণিল ত্রিপদী ছন্দে সোনামুখী গ্রামবন্দে

দূর হতে সবে প্রণমিল।

ভূমিকা লিখিলাম যাহা অন্তর্ভূমিকা অধিক তাহা

সন সাল লিখিত পাইল॥

বীরচন্দ্র গোস্বামীর কথা লিখা ছাপা দেখি তথা

পূর্ব্ব কথা জানিয়া যে লিখি।

পরে লিখি চট্টরাজের প্রাপ্ত লিপি ভক্ত সমাজের

দ্বিজ কৃষ্ণধন তার সাক্ষী॥

——

সমাধিয়া মন্দির যবে হইল নির্ম্মাণ।

দুই চারি ভক্ত মানসিক পূজা দিতে যান॥

পূজা কার্য্যের পুষ্প চন্দন আর মালসা ভোগ।

কার্য্য সারি যায় গৃহে পথে বালক যোগ॥

প্রসাদ দাও প্রসাদ দাও বলি বালকে না ছাড়ে।
দিতে দিতে সর্ব্বশেষ কিছু না গেল ঘরে ॥
পথিমধ্যে ভাবে ভক্ত পূর্ণ পাত্র চিঁড়া পাই।
যেমন দিলাম তেমনি পাইলাম ঠাকুর যে না খায় ॥
ইহা ভাবি মনে মনে সর্ব্বদিন চিন্তা যে করিল।
রাত্রিকালে স্বপ্নে মনোহর সাধু ভক্তকে কহিল ॥
পূর্ব্বে আমি শ্যামচাঁদের প্রসাদ সাক্ষাৎ খাইল।
এবে সমাধিতে প্রসাদের অমৃত পান কৈল ॥
সমাধির স্থলেতে তুলসী যোগে ভোগ হয়।
অগ্রে শ্যামচাঁদের হইলে পরে অধরামৃত আস্বাদয় ॥
মোর ভোগ শেষে দেখিবে মন্দিরের প্রণালী।
হস্ত ধোয়া জল শুক্ল নালি বহি যায় গলি ॥
তবে তো জানিবে মোর সেবন হইল চিঁড়া।
আগত কল্য পুনর্ব্বার তিন মলেসা অগ্রে বাড়া ॥
দেখিলে বিশ্বাস হবে সাদা জল হস্ত ধোয়া।
নহিলে জানিবে ভোগের দ্রব্যে আছে দব্য ধুয়া ॥
ইহা জানি পরদিনে পাঁচটি মাল্সা যে আনিল।
ভোগ দিয়া প্রণালী পার্শ্বে দৃষ্টি দিয়া যে রহিল ॥
ভোগ শেষে দেখে তবে সত্যই তাহা বটে।

পূর্ব্বেতে শুনেছি আর নিজ নয়নে দেখেছি।
দুই কথা লিখি এবে ভক্ত সন্মুখে দিতেছি॥
কূপের জল ভাসে তিন দিন তাহা বন্ধ হইল।
বোধ করি নালিতে বেশী জল ইহাও চলি গেল॥

তথা বিষ্ণুপুরাণে—

তস্যৈব কল্পনা হানং স্বরূপ গ্রহণং হি যৎ।
মনসাধ্যান নিষ্পাদ্যং সমাধি যোঽভিধীয়তে॥ ১

তস্যৈব—তৎ অস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য যৎস্বভাবতঃ স্বরূপং—বদন বাহু বক্ষঃ কটিপদ—বরবানাং গ্রহণং তথা তৎপারিষদসহ তদ্রূপ লাবণ্যং নির্ম্মল মনসি যৎ ধ্যানং তদেব সমাধি অভিধীয়তে কথ্যতে॥

সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবতঃ শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল নীলমণি বর্ণ, মধুরমুরতি স্বপারিষদের সহ মনের দৃঢ়তা পূর্ব্বক যে ধ্যান, অথবা নিজের পরমাত্ম র—ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীরূপবৎ সাজাইয়া মহাযোগপীঠে সখী মঞ্জরীর অনুগতভাবে, ঐ কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত, ইহা পঞ্চ-ভৌতিক দেহ নিশ্চলে রহিয়া যাইবে এই সমাধি ইহার পূর্ব্বে আর

অন্য কোন দেবদেবীকে মনে যেন না আনে, কেবল একমাত্র স্বপার্ষদে শ্রীরাধাকৃষ্ণ চিন্তায় সখীরূপা হইয়া সেবার নাম সমাধি ॥১

কতিপয় ভক্ত একদিন বিচার করয়ে গোপনে।
মনোহর ঠাকুরের প্রসাদ পূর্ণ পাইব কেমনে॥
পূর্ণ মালসা নাহি পাই বহু বালক এসে যে তথায়।
বালক বঞ্চনা কিসে হবে সে যুক্তি কর সর্ব্বথায়॥
পরে যুক্তি স্থির হইল অর্দ্ধরাত্রিতে ভোগ হইবে।
সেই কালে নির্জ্জনেতে ভোগের কার্য্য কেহ না জানিবে॥
ইহা স্থির করিয়া পূজারিকে জানায় যে গোপনে॥
তিন জনার মানসিক ভোগ রাখিল গোপনে॥
অর্দ্ধরাত্রে সমাধি মন্দিরেদীপ জ্বালি ভোগ হয়।
মনোহর ঠাকুর তখন গ্রামের বালকগণকে ডাকয়॥
নিদ্রাগত ছিল কেহ কেহবা জাগিয়া কথা কয়।
আস্তে ব্যস্তে উঠি সেপাড়া এপাড়া প্রসাদ নিতে ধায়॥
ভোগ সরিল বাহিরে এল প্রসাদের তিন মাল্‌সা।
বালকগণকে দিতে দিতে তিন মাল্‌সা হইল ফর্সা॥

মালসাতে প্রসাদ নাই রাত্রিতে জানিতে না পারে ।
বিতরণে সব ফুরাইল কিছু নাহি গেল যে ঘরে ॥
তবে জিজ্ঞাসয়ে তথা গ্রামের বালকগণ প্রতি ।
কি করে জানিলি সবে রাত্রি ভোগের গোপন পদ্ধতি ॥
বালকগণ বলে ওগো শুন শুন এক মহাশয় ।
খড়ম পায়ে খট্ খট্ করে কোন জন পথে চলি যায় ॥
ফুৎকারিয়ে বলে ওরে গ্রামের বালক বালিকা ।
চিঁড়া ভোগ লাগি রাত্রে বাটি হাতে শীঘ্র করি যা ॥
ইহা শুনি ক্রমে মোরা আসিয়া হেথায় পৌঁছিনু ।
সকলে সন্তুষ্ট হইয়া মোরা বহু প্রসাদ পাইনু ॥
ভক্ত সবে ইহা শুনি জানিল ঠাকুরের কারখানা ।
সমাধিতে বসিয়া জাগেন আর বালকের উপর সাধুপনা ॥
ইত্যাদি সংবাদ তথা গ্রমের মুখ্যগণে করে আলোচনা ।
বারশত চুয়াত্তর সালে পূর্ব্বে এসব ঘটনা ।
শুনিয়া মনেতে এবে হইল উদয় শুন ভক্তগণে ।
অর্দ্ধ তর্জ্জোর ছন্দে অর্দ্ধ পয়ারে বৈষ্ণব দাসের বর্ণনে ॥
কৃষ্ণধন চট্টরাজের লিপি লিখিতে লিখিতে ।
ইত্যাদি প্রকার ছন্দ জটিল আমার মনেতে ॥

বৈষ্ণবের মহিমা কিছু শুন সর্ব্বজন।
আউল বাউল সাঁই দরবেশ করিবে বিবেচন॥
চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি যাজন যাহার হয় নিত্য।
শান্ত দাস বৈরাগী দাস মনোহর দাস সত্য॥
অধুনা আর হয় কিছু শ্রীবৃন্দাবন ধামে।
আর কিছু আছে জগন্নাথ নবদ্বীপ ধামে॥

সন এগার পঁয়ত্রিশ সালে মনোহর ঠাকুরের চরিত্র বলে
বিস্তার লিখিল কৃষ্ণধন চট্টরাজ।
সন তেরশো পঞ্চাশ সালে কৃষ্ণভক্তের মৃত্যু নাহি বলে
কৃষ্ণভক্ত হয় সর্ব্বদা বিরাজ॥
কভু বৃন্দাবনে রহেন কভু মর্ত্ত্যে প্রকাশয়েন
কভু জীবে কৃপা প্রকাশিয়া।
আব্রহ্ম সর্ব্ব ক্রিমি পর্য্যন্ত কৃপাদৃষ্টি শেষ পর্য্যন্ত
দেবগণকে কম্পিত করিয়া॥
তার সাক্ষী প্রবল নারদ মুনি নলকুবেরের অন্যায় জানি
শাঁপেতে পাইল বৃক্ষ যোনি।

এমৎ বৈষ্ণবের বাণী সত্য সত্য ত্রিসত্য জানি
বৈরাগীর পদে নিত্য প্রণময়ে জ্ঞানী ॥
নতু ধর্ম্ম ব্যভিচারী দোষে স্তুতি না করহ বিশেষে
স্পর্শন না করিবে কোন মতে ।
দূর হইতে নিজ মনে মনে প্রণমিবে অন্তঃকরণে
স্পর্শ করিলে সিনানিবে ভাল মতে ॥
এইত গ্রন্থ হৈল শেষ মনোহর ঠাকুরে চরিত্র বিশেষ
এখনও তাঁহার মহিমা প্রবল ।
মানসিক করে যে যাহা ফলবান হতেছে তাহা
হয় না হয় কর দেখহ তাঁর বল ॥
পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করি মনোহর ঠাকুরের নাম ধরি
মানসিক করিবে চিঁড়ে মাল্‌সা ।
যদি আমার কার্য্য হয় দিব চিড়ে মাল্‌সা মহাশয়
শ্রীশ্যামচাঁদের ভোগ পরে এক মাল্‌সা ॥
ইহা বলি পাঁচসিকা তুলি ভক্তিভাবে রাখিবে বলি
মানসিক কার্য্য হইলে ভোগ দিব ।
কাঁচা দুগ্ধ কাঁচা গুড় সুগন্ধ দ্রব্য বৈঃ প্রচুর
চিপীটক ধৌত সহিত মিশাবে ॥

পকরম্ভা পক্ক ফল নারিকেল কোরা তার জল

সাজাইয়া তুলসী অর্পিবে ।

শ্যামচাঁদের ভোগ শেষে ঠাকুর শ্রীমনোহর দাসে

এক মাল্‌সা শেষ ভোগ দিবে ॥

মানসিক অবশ্যই ফলিবে ।

শ্যামচাঁদের পৃথক মন্ত্র মনোহর ঠাকুরের মঞ্জরী মন্ত্র

এই গ্রন্থে হইল যে যন্ত্র ।

এই বিধিতে ভোগতন্ত্র যথা তথা যোগাড় যন্ত্র

দক্ষিণা সহ বল ভোগ মন্ত্র ॥

ইতি সমাপ্তশ্চেদং শ্রীমন্মনোহর দাস

বৈরাগীনঃ জীবন চরিত্রং ॥

——

প্রকাশিত পত্রিকাদ্বয়—　　　　　। শ্রীপাদঈশ্বরপুরী।

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে প্রভুত গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ইতিহাস, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরিপূরক। সেই সকল অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিভাত করিবার জন্য 'এই "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী" নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হউন। এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আলাদা ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের সূচনা ঘটিয়াছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা এককালীন দুই শত টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ সত্বর গ্রাহক হউন।

যোগ যোগ ঠিকানা—
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা
পোঃ—হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা
ফোন—৫৮৫-০৭৭৫

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

(বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষন, গবেষনা ও প্রচার কার্য্যালয়)

বৈষ্ণব শাস্ত্র গাবষণায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথি প্রাচীন ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী থাকিলে উই, পোকায়, অযত্নে নষ্ট না করে এই সংগ্রহশালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষনায় সহায়ক হবে।